কলকাতার ছোট লখনৌ

অনিল তপাদার

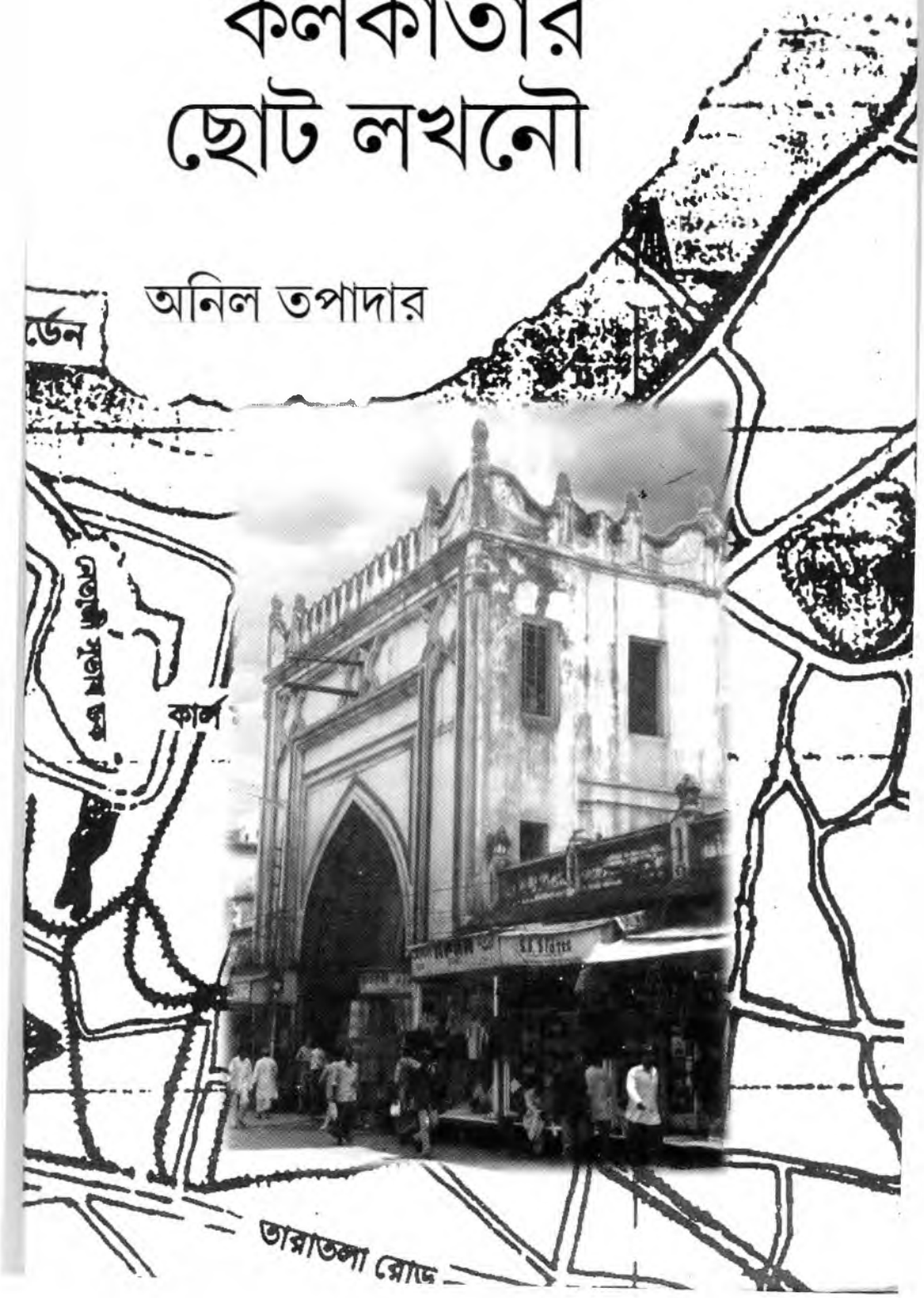

হালফিল মেটেবুরুজ

ইংরেজ বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করলে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা এবং বগুড়ার নবাব এবং ধনী পরিবারগুলো কলকাতার পার্কসার্কাস, চিৎপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। উদ্দেশ্য, নতুন শাসক প্রভুদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। আবার ১৭৯৯ সালে টিপু সুলতান যুদ্ধে নিহত হলে মহীশূর থেকে তাঁর পরিবারের লোকজন কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। চৌরঙ্গী-ধর্মতলা অঞ্চলে তাঁদের সম্পত্তি থাকলেও তাঁরা মূলত টালিগঞ্জ অঞ্চলে নতুন বসতি গড়ে তোলেন। এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতিতে বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রান্তের নবাব এবং রইস পরিবারগুলোর মধ্যে মেলামেশা এবং নতুন আত্মীয়তা গড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাঁদের দু-একজন মেটেবুরুজে সম্পত্তিও ক্রয় করেন।

১৮৮০ সালে মুর্শিদাবাদের জনৈকা সম্ভ্রান্ত মহিলা শামস্ জাহাঁ বেগম ফিরদৌস মহল (সি. আই.) মেটেবুরুজে ২৯ বিঘে জমি ক্রয় করেন। এই সম্পত্তির চৌহদ্দি ছিল, উত্তরে গার্ডেনরীচ রোড, দক্ষিণে ভাগীরথী, পুবে আয়রণ গেট রোড আর পশ্চিমে বিচালিঘাট রোড। ১৮৮৬ সালে তিনি ওয়াকফনামা মারফত সমস্ত সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তিতে পরিবর্তন করেন। মসজিদ এবং ইমামবাড়া (ফিরদৌস ইমামবাড়া) নির্মিত হয় সম্পত্তির মধ্যে। তা'ছাড়া, হিন্দুদের মন্দির তৈরি করার জন্য সামান্য জমিও দেওয়া হয়। বর্তমানে বাঙালি বাজার (একদা সুলতান বাজার), টুকরো পটি, বিফ্ স্টল প্রভৃতি এই ওয়াকফ্ সম্পত্তির মধ্যেই অবস্থিত। উক্ত ওয়াকফনামার নিয়ম অনুসারে সরাসরি বংশধরগণই (Direct descendants) ওয়াকফ্ সম্পত্তির দেখভাল করার অধিকারী। বর্তমানে, তদারকির দায়িত্বে আছেন সৈয়দ সাদিক রেজা ওরফে নবাব আলম। শামস্ জাহাঁ বেগম ফিরদৌস মহল নবাব আলমের প্রমাতামহী এবং নবাব ফরিদুনজা সৈয়দ মনসুর আলি মির্জা তাঁর প্রমাতামহ। নবাব আলম মুর্শিদাবদের নিজামত্ পরিবার থেকে রাজনৈতিক পেনশনও পেয়ে থাকেন বলে তিন দাবি করেন। উল্লেখ্য, এই মির্জা বংশেরই সন্তান পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসক তথা প্রেসিডেন্ট জেনারেল সৈয়দ ইস্কান্দার আলি মির্জা।

নবাব ওয়াজেদ আলির অন্যতম পুত্র ইব্রাহিম আলির সঙ্গে বিয়ে হয় টিপু সুলতানের এক নাতনির। বর্তমান প্রজন্মের কাজেম আলি মির্জার প্রপিতামহ ছিলেন মির্জা ইব্রাহিম আলি। ১৮৮৬ সালে তিনি জমি ক্রয় করে 'সিকান্দার মঞ্জিল' নামক বাসগৃহটি নির্মাণ করেন। ব্যবসায়ী কাজেম আলি মির্জা সিকান্দার মঞ্জিলেই বাস করেন।

মেটেবুরুজ আজ ঘুড়িশিল্পে ও সুচীশিল্পে যে অগ্রগতি করেছে, তা অনেকের কাছেই অনুকরণীয়। এই অগ্রগতি বা সাফল্যের পেছনে লখনৌয়ের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান রয়েছে।

নবাব ওয়াজেদ আলি নয়া লখনৌ পত্তন করার সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে ঘুড়ি আর মান্জা সুতো। মির রাজা হুসেন রাঙবের ছিলেন সে সময়ে লখনৌয়ের ঘুড়ি আর মান্জা তৈরির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারিগর। নবাবের সঙ্গে তিনিও চলে এলেন মেটেবুরুজে। নবাব পরিবার, তাঁদের কাছের

লোক, এবং 'রইস-আদমি'দের চিত্ত বিনোদনের যে সব বস্তু ছিল তার মধ্যে ভেড়ার লড়াই, বটের পাখির লড়াই আর 'কানাক্যার' বা ঘুড়ির লড়াই ছিল ব্যাপক ভাবে। জনশ্রুতি, এসবের মাধ্যমে জুয়া খেলাও হত। ঘুড়ি ওড়ানোকে কেন্দ্র করে নানা রকম মজার ঘটনাও ঘটত। ঘুড়ির সঙ্গে বেশ কিছু টাকা জুড়ে সেটাকে আকাশে ওড়ানো হত। তারপর লড়া হত ঘুড়ির প্যাঁচ প্রতিপক্ষের সঙ্গে। লড়াইয়ে ঘুড়ি কাটা গেলে, সে কাটা-ঘুড়ি ও টাকা লুটে নেবার বা ধরার জন্য মানুষের মধ্যে পড়ত হুড়োহুড়ি। সেখানে বয়সের কোন ভেদাভেদ থাকত না। এই হুড়োহুড়ি কখনও কখনও জীবনহানির কারণ হত। নবাবি খেয়াল, আর কি! এই 'পতঙ্গবাজি'কে আবার খেলাধূলার অঙ্গ হিসেবে গণ্য করে উপভোগ করা যায় লড়াকু মেজাজের এক নির্মল আনন্দ। ঘুড়ির লড়াইকে কেন্দ্র করে টুর্ণামেন্টও হত। জয়ী দল পেত শীল্ড বা কাপ। ঠুংরি গায়ক পিয়ারী সাহবেরে পুত্র জানি সাহবের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর ঘুড়ি ওড়ানোর মেজাজ নবাবি ঘরানায় পুষ্ট না হলেও, তিনি মেটেবুরুজের কারিগরের তৈরি ঘুড়ি ওড়াতেন না। তিনি বড় বড় ঘুড়ি ওড়াতেন আর সেগুলো আসত লখনৌ থেকে বিশেষভাবে প্যাকিং হয়ে। সে ঘুড়ি ওড়ানো দেখার জন্য দলে দলে লোক হাজির হত। ইয়ার-দোস্তরা প্রথমে আকাশে ঘুড়ি 'বাড়িয়ে' (উড়িয়ে) একটা বিশেষ অবস্থায় নিয়ে এলে 'হুজুর' চেয়ার থেকে উঠে এসে প্যাঁচ লড়তেন। লাটাই বা চড়কি থাকত কোন পার্শ্বচরের হাতে। যদি প্রতিপক্ষের ঘুড়িকে 'ভো-কাটা' করতে পারতেন, হুজুর বলতেন, 'উয়ো বাচ্চা হ্যায়। হামসে ক্যা টক্কর লেগা ?' যদি ফল উল্টো হত, সঙ্গীদের বলতেন, ' মানঝা ঠিক নেহি হ্যায়। বেহ্তরিণ মানঝা লাও।' বলা বাহুল্য, "পতঙ্গবাজি" শেষ হলে হুজুর ইয়ার দোস্তদের নিয়ে খানা-পিনা করতেন। বর্তমানে, মেটেবুরুজের ঘুড়ির কদর ভারতের সব জায়গায়, বিশেষ করে তামিলনাড়ুতে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে ঘুড়ি শিল্পের সূচনা হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর শেষে সে শিল্প প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষের অন্ন যোগাচ্ছে।

নবাব ওয়াজেদ আলিকে অনুসরণ করে যে সব সূচীশিল্পী মেটেবুরুজে বাস করতে থাকল, তারা তৈরি করত লখনৌ ঘরানার পোশাক পাজামা, পাঞ্জাবি, আঙ্গর্খা, আচ্কান, মির্জাই, শিমলা (পাগড়ি), ঝুলা (টুপি), শলুকা প্রভৃতি। সেগুলোর উপর করা হত বিচিত্র বুটি, লতাপাতা, আর ফুলের কারুকার্য। খুব সূক্ষ্ম কাজ। তাদের ভাষায় 'কাশিদাকারি'।

গ্রাম মেটেবুরুজের আদি বাসিন্দাদের মধ্যে নিম্নবর্গের হিন্দুরা ছিল বেশ ভাল সংখ্যায়। তাদের মধ্যে আবার তাঁতি, ধোপা, কামার, কুমোর এবং কৃষিজীবী মানুষ ছিল প্রধান। এখনও গ্রাম-বাংলায় দর্জিগিরিকে পুরোপুরি পেশা হিসেবে নিয়ে থাকে খুব কম লোকে। চাষ-আবাদের পর ফুরসত পেলে, তবেই নগণ্য সংখ্যক লোক দর্জিগিরি করে থাকে। কিন্তু আজকের মেটেবুরুজের বাঙালি দর্জি তথা ওস্তাগার সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মানুষের ভাবনা-চিন্তা ভিন্ন খাতে বইতে থাকবে। ব্যাপক সংখ্যায় নিপুণ সূচীশিল্পী এল কোথা থেকে আর কিভাবে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল, তার একটা যুক্তিসম্মত কারণ থাকা উচিত। স্থানীয় কবি প্রয়াত ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় তাঁর 'গার্ডেনরীচ, মেটিয়াব্রুজ' শীর্ষক কবিতায় এ সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করতে চেয়েছেন।

'ফতেপুরের সাধু যারা, বদরতলার দর্জি,
আদিম অধিবাসী এলো খুঁজতে নবাব মরজি।।
নিম্নবর্ণ হিন্দু ছিল, শ্রমজীবী আর চাষী,
ব্রাহ্মণাদি যৎসামান্য ছিল এদেশবাসী।
নবাব আসার সাথে সাথেই উঠলো জেগে দেশটা,
মুসলমানের ধর্ম গ্রহণ করলো বহু শেষটা।
'মল্লিক', 'মণ্ডল', উপাধি সব নামের শেষে রইলো,
মুসলমানও হলো তারা যুগের ধর্ম রইলো।'

গ্রাম-মেটেবুরুজের দর্জি তৈরি করত সাধারণ মানের ফতুয়া, নিমা, পাজামা, টাকা রাখার গেঁজে প্রভৃতি। লখনৌয়ের সূচীশিল্পীরা মেটেবুরুজে এলে, সম্ভবত উন্নতমানের কাজ শেখার তাগিদে, বাঙালি দর্জি তাদের সংস্পর্শে এসেছিল, অথবা নবাগত পরিবারগুলোর ক্রমর্ধমান পোশাকের চাহিদা পুরণ করতে লখনৌয়ের সূচীশিল্পীরা স্থানীয় কিছু লোককে নিয়োগ করেছিল, অথবা উভয়ের তাগিদ পরস্পরকে কাছে এনেছিল। এবং ক্রমশ আদান-প্রদানের ভেতর দিয়ে তাদের ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে। মেটেবুরুজের বটতলা এবং লাগোয়া মহল্লায় সবচেয়ে বেশি দর্জির বাস। যুগিপাড়া, ধোপাপাড়া, ধাবাপাড়া প্রভৃতি মহল্লা যে এককালে হিন্দু তাঁতি, ধোপা, কামার, কুমোর, জেলে অধ্যুষিত ছিল, জায়গার নামকরণেই সেটা সুস্পষ্ট। তবে, তারা ধর্মান্তরিত হয়েছিল কি না, তা' প্রমাণ সাপেক্ষ। সম্ভবত মেটেবুরুজের বাঙালি মুসলিম দর্জি সম্প্রদায়ের মধ্যে 'মল্লিক' 'পুরকাইত' 'হালদার', 'বিশ্বাস', 'ভুঁইয়া', 'মণ্ডল', ইত্যাদি পদবিধারী লোক, খুব সচেতনভাবেই, পূর্ব-পুরুষ হিন্দুদের বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছেন।

বাঙালি দর্জিরা লখনৌওয়ালাদের সংস্পর্শে এসে নিপুণ সূচীশিল্পীতে পরিণত হয়েছিল। দেশের পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে এই অর্জিত শিল্পনৈপুণ্য তাদের পেশায় এবং জীবিকায় এক বিশেষ মাত্রা সংযোজন করে। ভারতের রাজধানী হওয়ার সুবাদে, তখন কলকাতায় ইংরেজ ছাড়াও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের লোককে থাকতে হত। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি এবং সরবরাহের জন্য কলকাতায় জন্ম হল ইউরোপীয়দের টেলারিং হাউস র‍্যাণকেন, ফেল্‌প্‌স, হার্ণক অ্যাণ্ড বয়েস, র‍্যামসে ওয়েকফিল্ড, ফ্রানসিস্ র‍্যামসে প্রভৃতি। তাছাড়া, 'নেটিভ'দের দু'একট প্রতিষ্ঠানও ছিল, যেমন -- গিরীশ চন্দ্র দে অ্যাণ্ড কোম্পানি। সাহেব খদ্দের আকর্ষণ করার জন্য তারা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিত --

Our Tailoring Department is under management
of a First Class European Cutter

কিন্তু এরকম অবস্থা বেশি দিন রইল না। ইউরোপীয় ঘরানার পোশাকের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলে সাহেব প্রতিষ্ঠানগুলি নেটিভদের কাজে নিয়োগ করতে শুরু করে। উদ্দেশ্য, তাদের কম মজুরিতে খাটান যাবে এবং মালিকদের লাভও বেশি হবে। ফলে, সাহেবদের টেলারিং হাউসে চাকরিতে মেটেবুরুজের সূচীশিল্পীরা অগ্রাধিকার পেতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যেই নেটিভ

দর্জিরা সাহেবদের থ্রি-পিস সুট, শার্ট, টাই, এবং মেমদের গাউন, ফ্রক ইত্যাদি পোশাকের কাটিং এবং সেলাই রপ্ত করে ফেলল। তাদের সূক্ষ্ম ও সুন্দর হাতের কাজ সাহেব মেমদের চোখে ধরল। কয়েক বছর পরে, মেটেবুরুজের সূচীশিল্পীদের একাংশ সাহেবদের টেলারিং হাউসের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখা দিল। তারাও টেলারিং হাউস খুলল। দর্জিদের মধ্যে যারা ব্যবসা শুরু করল, তারা বনে গেল ওস্তাগার। শ্রমিক দর্জি নাম ঘুচে গেল তাদের। কলকাতা শহরে সাহেবদের টেলারিং হাউস আর নেই বললেই চলে। শুধু ফেল্‌পস অ্যাণ্ড কোম্পানি, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে এখনও সাইন বোর্ড টিকিয়ে রেখেছে, যদিও মালিকানা এখন এদেশীয়।

এবার কলকাতার অভিজাত এলাকায় সাহেব বাড়িতে ডাক পড়ল মেটেবুরুজের দর্জির। স্যুট, ফ্রক, গাউন, দরজা-জানালার পর্দা, ল্যাম্প শেড প্রভৃতির অর্ডার পেতে থাকল সে। সাহেব গোটা থান কাপড় কিনে দর্জিকে দিত। দর্জি গাঁটরি বেঁধে সেগুলোকে ঘরে নিয়ে আসত। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে 'কাম' কেটে এবং 'সিইয়ে' আবার গাঁটরি বেঁধে সেগুলো সাহেব বাড়ি পৌঁছে দিত। আপাত খুশি মেমসাহেব যখন তার প্রিয় 'ডোরসি'-কে তার চাহিদার চেয়ে ঢের বেশি মজুরি দিত, দর্জির চোখে-মুখে ভেসে উঠত এক সলজ্জ কৃতজ্ঞতার হাসি, আর মনে মনে বলত 'মেমসাব জিন্দাবাদ'। বস্তুতপক্ষে, একটি কিম্বা দু'টি সাহেব পরিবারের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং গৃহসজ্জার পর্দা, টেবল ক্লথ, বালিশের কভার ইত্যাদি তৈরি করে একটি দর্জি-পরিবারের সারা বছরের ভরণপোষণ ভালভাবে চলে যেত। সাহেব, মেম এবং তাদের বাচ্চাদের পোশাকের চাহিদা একজন দর্জিকে বছরভর ব্যস্ত রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সাহেব মেম বিলেতে ফিরে যাওয়ার পরেও সেখান থেকে অর্ডার আসত মেটেবুরুজে, এমন নজিরও আছে। বটতলার 'কাসেম টেলার্স' বেশ নাম করেছিল। তখন মাপ না নিয়ে গাউন সেলাইয়ের দক্ষ দর্জিও পাওয়া যেত।

সাহেব যে গোটা গোটা থান কাপড় দর্জিকে দিত, তা থেকে কিছু ছাঁট বের হ'ত বা ইচ্ছাকৃতভাবে ছাঁট বের করা হ'ত। সেসব দামি কাপড়ের টুকরো ছিল আম-জনতার লোভের বস্তু। দর্জিরা টুকরোগুলোকে খুব কম দামে, মেটেবুরুজ বাঙালি বাজারের পাশে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসে বিক্রি করত। এভাবেই জন্ম হল বাঙালি বাজার টুকরো পটির। টুকরো পটির খ্যাতি শুধু মেটেবুরুজ, খিদিরপুরে নয়, কলকাতার এক বিরাট অংশে, বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু লোক প্রতিদিন টুকরো পটিতে প্যান্ট, শার্ট আর ফ্রকের টুকরো কাপড় কিনতে আসত। টুকরো পটির রমরমা অবস্থাটা বজায় ছিল পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত। কারণ, সাহেবরা ক্রমশ ভারত ছেড়ে স্বদেশে চলে যাচ্ছিল। টুকরো পটিতে আজ টুকরো কাপড় বিক্রি হয় না।

ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে গেলেও, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেশি শিক্ষিতের একাংশকে বেশ প্রভাবিত করে। এর মানে এই নয় যে, ইংরেজ এদেশে থাকাকালীন ভারতীয়রা কেউ সাহেবি পোশাক পরত না। নিশ্চয় পরত, তবে খুব কমলোকে। অতএব, মেটেবুরুজের দর্জি এবার দেশি সাহেবদের সাজাতে কলকাতার বহু জায়গায় টেলারিং হাউস খুলে বসল। ষাটের দশকে সিন্থেটিক বস্ত্র আবিষ্কার এবং তুলাজাত বস্ত্রের ক্রমবর্ধমান মূল্য, এই দুটো কারণে প্যান্ট-শার্টের প্রতি সাধারণ মানুষ আরো বেশি করে আকৃষ্ট হয়।

এই অবস্থাটা মেটেবুরুজের দর্জির পক্ষে মন্দ ছিল না। কিন্তু ষাটের দশকের মাঝামাঝি বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং দিল্লিতে তৈরি উন্নতমানের প্যান্ট এবং শার্ট কলকাতাসহ পূর্ব-ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলে। মেটেবুরুজকে সম্মুখীন হতে হল অসম প্রতিযোগিতার। বিদ্যুৎচালিত আধুনিক সেলাই মেশিন বনাম পদচালিত সেকেলে উইলসান (ওদের ভাষায় 'বক') মেশিন আর সিঙ্গার মেশিন। বৃহৎ পুঁজি বনাম ক্ষুদ্র পুঁজির লড়াই। তাহলে, শতাধিক বছরের অভিজ্ঞতা কি রাতারাতি নস্যাৎ হয়ে যাবে? মেটেবুরুজের দর্জি সাময়িক একটা ধাক্কা খেল বটে, কিন্তু দমল না। এবার, তারা বেশি গুরুত্ব দিল মহিলা ও শিশুদের রেডিমেড পোশাকের ওপর। হরেকরকমের কারুকার্যময় সূচীশিল্পে চাই দক্ষতা এবং বেশি শ্রমশক্তি। এ দুটোই মেটেবুরুজের দর্জির প্লাস পয়েন্ট।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত হবে যে, মেটেবুরুজের দর্জিদের একটা অংশ রেডিমেড পোশাক, বিশেষ করে ছোটদের প্যান্ট, শার্ট, ইজের, ফ্রক ইত্যাদি তৈরি করত। অবিভক্ত বাংলার কলকাতাসহ ঢাকা, খুলনা, যশোহর, বরিশাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জায়গা — এক কথায়, বর্তমান বাংলাদেশ — ছিল তাদের পণ্যের বাজার। দেশ ভাগ হওয়ার পর তাদের ব্যবসা মার খায়। এবার তারা প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, ওড়িশা এবং অসমে ব্যবসা ক্ষেত্র খুঁজতে সচেষ্ট হল। হাওড়ার মঙ্গলা হাট, কলকাতার হরিসাহার হাট আর চেতলার হাটে তারা পসরা সাজিয়ে বসত।

বিগত শতাব্দীর সত্তর দশকে নিরাপত্তাহীনতার কারণে, এক বিশেষ পরিস্থিতিতে, হাওড়ার মঙ্গলা হাটকে প্রায় বর্জন করতে বাধ্য হল মেটেবুরুজের ওস্তাগার দর্জি সম্প্রদায়। রেডিমেড পোশাক বিপণনের প্রশ্নে অবশ্যই মস্ত ঝুঁকি। বস্তুতপক্ষে, এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়ল তারা। শেষ পর্যন্ত, সমস্ত রকম প্রতিকূলতাকে জয় করে ওস্তাগার — ব্যবসায়ীরা প্রমাণ করে দিল যে, ঐকান্তিক ইচ্ছা, নিষ্ঠা এবং নিরলস কর্মই সাফেল্যের চাবিকাঠি। হাওড়া রেল স্টেশনের লাগোয়া বিখ্যাত হাটকে এড়িয়ে, আরও প্রায় ঘন্টাখানেকের বাসরাস্তা অতিক্রম করে, সুদূর ভিন রাজ্যের ব্যবসায়ীরা যখন রেডিমেড পোশাক গস্ত করতে মেটেবুরুজের হাটে গঞ্জে হাজির হয়, তখন ওস্তাগার-দর্জিদের উক্ত গুণাবলিকেই তারা স্বীকৃতি দেয়।

ওস্তাগার-ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, সত্তর দশকে মস্তান আর তোলাবাজরা হাওড়ার মঙ্গলা হাটে যে অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল, আজ তার অবসান ঘটেছে। তারা সেখানে শান্তিতে ব্যবসা করতে পারছে। রাজ্য সরকার তাদের অসুবিধাগুলোর বিষয়ে সচেতন এবং সহানুভূতিশীল। মেটেবুরুজ-বিচালিঘাট থেকে হাওড়া ফেরিঘাট লঞ্চ সার্ভিস চালু হয়েছে। ফলে, তাদের পক্ষে পণ্য নিয়ে হাওড়া হাটে যাওয়া সহজতর হয়েছে। তবে ইদানীং এখানকার কাশ্যপপাড়া ও সংলগ্ন এলাকায় প্রমোটার ও মাফিয়াচক্রের অশুভ তৎপরতাও বাস্তব ঘটনা।

দর্জি-ওস্তাগারদের সম্বন্ধে আরো জানতে হলে যেতে হবে দলিজে। পোশাক তৈরির কারখানা। সব দলিজের চেহারা মোটামুটি একই রকম। সদা-ব্যস্ত হারুণ, বেলাল, নিজাম, নূরহোসেনদের দেখা মিলবে সব দলিজে। আধুনিক সেলাই মেশিন কিম্বা সাবেক জমানার 'বক' মেশিনে বকের মতই ঘাড় গুঁজে দু'খানা হাত আর দু'খানা পা সমান তালে চালিয়ে যাচ্ছে তারা। সাত-আটখানা

মেশিনের খচ্‌খচানি সৃষ্টি করেছে বিচিত্র ঐকতান। কাটা কাপড়ের টুকরোগুলো একত্রিত হয়ে মনোহর পোশাকের চেহারা নিচ্ছে। নানা আকারের, নানা ডিজাইনের। ক্রেতার রুচিকে সম্মান দিতে এরা খুবই সচেতন।

দলিজে আগন্তুক দেখলেই হারুণ-বেলালদের কেউ, আগন্তুকের প্রশ্ন শোনার আগেই, ঘাড় কাত করে চোখের ইশারায় কারও দিকে যেতে বলবে। আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলে নষ্ট করার মতো সময় তার নেই। যতক্ষণ সে কথা বলবে, ততক্ষণে হয়ত একটা শার্টের কলার জোড়া যাবে। কারণ, তাকে 'ফুরন'-এ কাজ করতে হয়। যত বেশি কাজ, তত বেশি পয়সা। যাইহোক, তার ইঙ্গিত অনুসরণ করে আগন্তুক যদি তাকান তবে তার চোখে পড়বে দলিজের এক পাশে, মাদুরে আসীন, লুঙ্গিপরা এক মধ্যবয়সীকে। তিনি-ই ওস্তাগার, ব্যবসার মালিক। তার সামনে ভাঁজ করা কাঁড়ি কাঁড়ি থান কাপড়। ওদের ভাষায় 'কাম'। পাশে নীল রঙের চক। থানের ওপর দাগ দেওয়ার জন্য। কাম কাটার জন্য ডান হাতের আঙুলে আটকানো একখানা জাম্বো 'কেঁইচি'। আগন্তুককে দেখে ওস্তাগার সাহেব ক্ষণিক থামলেন এবং তারপর আগন্তুককে সামনে এগিয়ে যেতে আহ্বান করলেন। আগন্তুকের ব্যক্তিত্ব এবং পোশাক তাঁর সম্বন্ধে ওস্তাগারের মনে সম্ভ্রম জাগিয়ে থাকবে। ওস্তাগার থান কাপড়ের স্তূপ হাত দিয়ে সরিয়ে 'মেহমান'-কে বসার জায়গা করে দিলেন। কোনোরকম ভূমিকা না করেই, সরাসরি সংলাপ আওড়ালেন তিনি, 'কি খাবেন, ঠাণ্ডা না গরম?' ওস্তাগার সাহেবের ঠোঁট দু'টো তাম্বুল-রাগে রঞ্জিত। মহার্ঘ জর্দার সুগন্ধে ম-ম করছে দলিজ। আগন্তুকের জবাব পাওয়া মাত্র ওস্তাগার সাহেব লুঙ্গির সামনের গেরো খুলে একটা কুড়ি টাকার নোট বের করে পাশের বাচ্চাটাকে বললেন, 'ময়না, দু'টো ঠাণ্ডা পানি লিয়ে আয়।' এই দর্জি এলাকায় সব বাচ্চাকেই 'ময়না' সম্বোধন করা হয়। আগন্তুকের সঙ্গে পরিচয়-পর্ব শেষ করে এবং উদ্দেশ্যে জেনে নিয়ে জুবের আলি মোল্লা সাহেব যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে ঃ ঠাকুরদার আমলে দর্জিগিরি শুরু। তাঁর পাঁচ ছেলের চারজন ভাগ্যান্বেষণে ইংরেজ জমানায় ইন্দোনেশিয়া চলে যায়। সে সময়ে মেটেবুরুজের কিছু দর্জি-সন্তান সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় চলে গিয়েছিল। দর্জি পেশাকে কেন্দ্র করেই ঐসব দেশে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং 'বে-শাদি' করে থেকে গেছে। মাটির টানে দেশে ফিরে এসেছে অল্প কয়েকজন এবং জুবের আলি মোল্লার 'আব্বাজান' তাদেরই একজন। রেডিমেড পোশাকের জনপ্রিয়তা হালফিল ব্যাপার। এই ব্যবসার একটা বিশেষত্ব, এক একটি দলিজে এক রকমের পোশাক তৈরি হয়। যে ওস্তাগার পাঞ্জাবির ব্যবসা করে, তার দলিজে শুধু পাঞ্জাবি তৈরি হয়। অন্য কিছু তৈরি হয় না। অনুরূপভাবে কোথাও বাবাসুট, কোথাও 'ফারাক' আবার কোথাও বা সালোয়ার-কামিজ। যিনি পাঞ্জাবি তৈরি করেন, তার শার্ট এবং ট্রাউজার পরার সখ হলে, তিনি অপর দর্জিকে মজুরি দিয়ে শার্ট-ট্রাউজার তৈরি করিয়ে নেন বা বাজার থেকে কিনে আনেন।

বর্তমানে, মেটেবুরুজের দর্জিদের অধিকাংশই ওস্তাগার-ব্যবসায়ী। হাফ-ওস্তাগারও কিছু আছে। তারা নিজে কাম কাটে, সেলাই করে এবং হাটে নিয়ে মাল বিক্রি করে। তাই ডায়মণ্ডহারবার, ক্যানিং, জয়নগর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হুগলী প্রভৃতি এলাকা থেকে শ্রমিক-দর্জি আমদানি করা

হয়। খাবার এবং থাকবার জায়গাও প্রয়োজনে দিতে হয়। শ্রমিকেরা 'ফি-হপ্তায়' মজুরি পায়। সেলাই মেশিন, ফুলের মেশিন (এমব্রয়ডারি কিম্বা জিগজ্যাগ মেশিন) এবং 'বোতামের ঘাট' সেলাই মেশিনে যারা কাজ করে তাদের প্রত্যেকে গড়ে ১২০০-১৫০০ টাকার কাজ করে প্রতি সপ্তাহে। অবশ্য, সেজন্য ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা কাজ করতে হয় প্রত্যহ। কিন্তু, পেশায় পুরো নিয়ন্ত্রণ রাখতে দূরদর্শী এবং ঝানু ওস্তাগার নিজের 'ছাবাল'-দের সাত-আট বছর বয়স থেকেই দলিজের খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে সব কাজ ধাপে ধাপে শিখিয়ে দেয়। ট্রেড ইউনিয়নের যুগে সব কারবারেই কিছু আশঙ্কা কাজ করে। তাই, যেকোনো পরিস্থিতিতে, উৎপাদন অব্যাহত রাখতে, ঘরের ছেলেদের সবকিছুই শিখিয়ে রাখতে হয়। উৎপাদনের প্রশ্নে বাইরের শ্রমিকের উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে রাজি নয় মেটেবুরুজের ওস্তাগার।

ওস্তাগারের ছেলেদের দলিজে দেখা মিললেও তাদের মেয়েরা পারিবারিক ব্যবসায়ে উৎপাদনে কোনোভাবে অংশ নেয় কিনা প্রশ্ন করা যেতে পারে। হয়ত, পর্দানশীনতার কারণে তারা বাড়ির ভিতরে কাজ করে, দলিজে বসে করে না।

দর্জি-ওস্তাগারের ছেলে খুব কম বয়সেই রোজগার করতে শেখে। ফলে, কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকলে, তাড়াতাড়ি 'শ্যায়না' হয়ে বরাসনে বসে। সঙ্গত কারণেই মেটেবুরুজের দর্জি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার হার কম। তবে ছেলেদের থেকে মেয়েদের শিক্ষার হার বেশি। আবার, স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে পড়ছে, এমন মেয়ের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র পাওয়া যাবে না, এই অজুহাতেও দর্জি-পরিবারের মেধাবী মেয়ের উচ্চশিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। তার ক্ষীণ প্রতিবাদ রক্ষণশীলতার কালো বোরখায় ঢাকা পড়ে যায়।

মেটেবুরুজের ওস্তাগারদের এই রমরমা অবস্থার মধ্যেও একটা আশঙ্কা ভিতরে ভিতরে কাজ করে চলেছে। মেটেবুরুজের হাটে-গঞ্জে ভিন রাজ্যের পোশাক ক্রেতার সংখ্যা একটু একটু করে কমতে শুরু করেছে। সঙ্গত কারণও আছে এই বিমুখীনতার পেছনে। বাইরের ব্যবসায়ীরা শুধু পণ্য গস্ত করেনি, তারা অবিশ্বাস্য অঙ্কের মোটা বেতন দিয়ে হাইজ্যাক করেছে মেটেবুরুজের কিছু সুদক্ষ সূচীশিল্পীকে। আজ তাদের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, ওড়িশা আর অসমে তৈরি হচ্ছে সুন্দর রেডিমেড পোশাক। জুবের আলিদের কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তার কারণ এখানেই। কিন্তু, শতাব্দী-প্রাচীন ঐতিহ্য আর প্রশ্নাতীত দক্ষতা কি হার মানবে ভিন রাজ্যের হাইজ্যাকারদের কাছে?

ওয়াজেদ আলির 'দুনিয়াবী জন্নত' কিম্বা ফরাসি অধ্যাপক গারিণ-দ্য তাসির 'প্রাচ্যের ভেনিস'-এর প্রায় সব কিছুই ছারখার করে দিয়েছে ইংরেজ, নবাবের সম্পত্তিকে নিলামে তুলে। নিলাম করতে পারেনি শুধু সামান্য পরিমাণ 'ওয়াকফ্'-এর সম্পত্তি (দেবোত্তর সম্পত্তি)। বর্তমান শতাব্দীর মানুষ নবাবের ছোট লখনৌয়ের দর্শন না পেলেও, ছোট শহরটির রূপের খ্যাতি এখনও কিছু মানুষের মুখে মুখে এক অভিনব 'শ্রুতি' হয়ে ঘোরাফেরা করে। কান পাতলেই শোনা যাবে সেসব কখনও কখনও সে রূপের বর্ণনা বাস্তবের সীমারেখা পেরিয়ে কল্পলোকে বাসা বাঁধে। শ্রোতা বিমুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে বক্তার মুখ-নিঃসৃত প্রতিটি শব্দ গোগ্রাসে গিলে তার বলার উৎসাহকে আরও

বাড়িয়ে দেয় নিজের অজান্তেই। শ্রোতা যখন কল্পলোকের 'জন্নত' থেকে কক্ষচ্যুত হয়ে বাস্তবে ছিটকে আসে, তখন তার চোখে পড়ে এক জ্যান্ত 'দোজখ', যা কবি মিলটনের কল্পিত 'পার্গে টোরিও'-কে অতি সহজে টেক্কা দিতে পারে।

'প্রাচ্যের ভেনিস'কে 'ভ্যানিশ' করে দখল নিয়েছে ঘিঞ্জি অস্বাস্থ্যকর স্লাম। বস্তি আর বস্তি। সম্ভবত পৃথিবীর বৃহত্তম বস্তি অঞ্চল। গার্ডেনরীচ-মেটেবুরুজের প্রায় অর্ধেকটাই বস্তি অধ্যুষিত। সরু সরু গলি, উপগলি আর কানাগলি কাঁধ ধরাধরি করে বিশাল এক অক্টোপাসের চেহারা দান করেছে বস্তিকে। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক পর্য্যন্ত এই সব গলির দু'ধার ছিল উঁচু, আর মাঝখানটা নৌকোর খোলের মত। গলির একপাশ দিয়ে, কখনও বা মাঝখান দিয়ে তৈরি হয়েছে সরু সরু নর্দমা। ওরা বলে 'নালি'।

১৮৬৯ সালে গঠিত হ'ল সাউথ সুবার্বান টাউন কমিটি। গার্ডেনরীচ এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত ছিল। আটাশ বছর পরে ১৮৯৭ সালে জন্ম গার্ডেনরীচ পুরসভার। পুরসভা গঠনে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ক্লাইভ জুট মিলের অফিসার মিঃ ওয়ালেস এবং ব্যারিষ্টার উন্‌সাদ-উদ-দৌলার নাম যথাক্রমে চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে পাওয়া যায়। কলকাতা বন্দরের সবচেয়ে কাছে মেটেবুরুজ। ফলে, এখানে গড়ে উঠতে থাকে ছোট-বড় শিল্পকারখানা। কারখানার শ্রমশক্তির চাহিদা মেটাতে নানা ভাষাভাষী, বিশেষ করে উর্দুভাষী, হিন্দিভাষী আর ওড়িয়াভাষী লোক ভিড় করল মেটেবুরুজে। কারখানার আশেপাশেই তারা বাস করতে শুরু করল। জমিদারের থেকে নেওয়া ঠিকে জমির ওপরে টালিখোলা আর ছিটেবেড়ার বাড়িঘর এলোমেলো ভাবে তৈরি হতে থাকল। পুরকর্তাদের অদূরদর্শিতা, গাফিলতি বা সস্নেহ উদাসীনতাই যে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বস্তি অঞ্চলের জন্মদাতা, একবিংশ শতাব্দীর মানুষ যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় তবে সে কি ভুল করবে?

১৯২৩ সালে অবিভক্ত বাংলার পুরমন্ত্রী স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আইন সভায় পাশ করালেন 'মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট'। এই আইনটিতে, বহু বিষয়ের মধ্যে একটি ছিল, কলকাতা পুরসভার এলাকা বিস্তৃতিকরণ। ক্রমবর্ধমান নাগরিকদের আধুনিক এবং উন্নততর পুর-পরিষেবা দেওয়ার জন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। গার্ডেনরীচ এবং আরও তিনটি পুর এলাকা কলকাতা পুরসভার অন্তর্ভুক্ত হ'ল। মেটেবুরুজের রাস্তাঘাট উন্নত হ'ল। রাস্তায় বিজলি বাতি জ্বলল। অন্তর্হিত হ'ল কেরোসিনের বাতিস্তম্ভ। ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ লাইনের বিস্তার হ'ল। টালা ট্যাঙ্কের পরিস্রুত এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের স্বাদ পেল (যদিও জল স্বাদহীন) গার্ডেনরীচ-মেটেবুরুজের মানুষ। সুখী হল তারা।

গ্রাম্য প্রবাদ আছে 'এত সুখ যদি তোর কপালে, তবে কেন ছেঁড়া ক্যাঁথা বগলে?' এই সামান্য সুখটুকুও সাধারণ মেটেবুরুজবাসীর কপালে সইল না। ছেঁড়া কাঁথা বগলের দুর্গন্ধ খুঁজতে সচেষ্ট হল। গার্ডেনরীচ পুরসভা থাকাকালীন যারা ক্ষমতার স্বাদ তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করতেন আর আম জনতার ওপরে ছড়ি ঘুরোতেন, তাদের জিবে টালা ট্যাঙ্কের পরিশোধিত জল বড়ই বিস্বাদ